রঙশ্রী কথাচিত্রের নিবেদন
কৃপাণ
পরিচালনা - অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

রঙ্গশ্রী কথাচিত্র লিমিটেডের

তৃতীয় নিবেদন

কৃষাণ

—সংগঠনকারী—

প্রযোজনা : সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ ও
কমল বসু

কাহিনী ও সংলাপ : মন্মথ রায়

অতিরিক্ত সংলাপ : নবেন্দু ঘোষ

চিত্রায়ণ : রামানন্দ সেনগুপ্ত
সন্তোষ গুহ রায়

ঐ সহযোগী : তারক দাস

শব্দানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

সুরসৃষ্টি : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

গীতিকার : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
বিমল চন্দ্র ঘোষ
গোবিন্দ চক্রবর্তী

শিল্প-নির্দেশ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক

ব্যবস্থাপনা : জিতেন গল

নৃত্য পরিকল্পনা : বুলবুল চৌধুরী

রূপসজ্জা : রামু

সাজসজ্জা : নারায়ণ

তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস ভট্টাচার্য

কর্মসচিব : শচীন ভট্টাচার্য

স্থিরচিত্রায়ণ : স্টীল ফটো সার্ভিস

পরিস্ফুটনা : বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীস্

পরিবেশনা : নারায়ণ পিকচার্স

—সহকারী—

পরিচালনা : নবেন্দু ঘোষ
পিনাকী মুখোপাধ্যায়

চিত্রায়ণ : অমিয় সেন

শব্দানুলেখন : দেবেশ ঘোষ
মৃণাল গুহ ঠাকুরতা

শিল্পনির্দেশ : সুবোধ দাস

সম্পাদনা : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা : ভবানী ঘোষ
বিনোদ মিশ্র

রূপসজ্জা : পচা

তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : ভীষ্ম, কমল, নরেশ,
রতিকান্ত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঐ সহযোগী : সুনীল মজুমদার

রূপশ্রী ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

রূপায়নে

শিপ্রা দেবী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, জীবেন বসু, স্বাগতা চক্রবর্তী, সাধন সরকার, প্রীতিধারা, বুলবুল চৌধুরী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, মনোরমা (ছোট), শেফালী সরকার, শৈলেন পাল, পঞ্চানন ভট্টাচার্য কুমার মিত্র, ভানু বন্দ্যোঃ (এ্যাঃ), ঠাকুরদাস মিত্র (এ্যাঃ), হৃষি বন্দ্যোঃ, বিনয় মুখোঃ, নকুল, সহদেব, মাষ্টার মলয়, সত্যব্রত, নিরঞ্জন, ছন্দা, হৃষিদাস প্রভৃতি।

কাহিনী

কল্যাণপুর গ্রামে অর্জ্জুন মণ্ডলের নাম আছে। ওস্তাদ তবলচি সে। তবে চাষী মানুষ, তার খ্যাতি আর দু'তিনটে গ্রাম এলাকার বাইরে ছড়ায়নি।

অর্জ্জুনের অবস্থা ভালো নয়। বাড়ীতে বৌ দুর্গা, দশ বছরের ছেলে লক্ষণ আর বাপ। সেই বুড়ো বাপ গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাড়ি খায়, গাজনের সময় বুড়ো শিব সেজে নাচে আর আপনমনে বিড় বিড় করে। বুড়ো পাগল।

বাপের পাগলামী আর অর্জ্জুনের দুরবস্থার মূলে একই লোক—তার নাম যুধিষ্ঠির মহাজন। মণ্ডলদের সাবেক ভিটে আর কুয়ো, এমনকি কয়েক বিঘে ছাড়া সমস্ত ধানের জমিই ইতিপূর্ব্বে ক্রোক করেছিল মহাজন। তখন থেকেই অর্জ্জুনের বাপ পাগল হয়ে গেছে।

যে কয় বিঘে জমি ছিল তার ফসলও এবার গোলায় তুলতে পারল না অর্জ্জুন। মহাজনের হিসেব কড়া। তার হিসেবে দেনা কখনই শোধ হবার নয়—তা শাশ্বত।

অবস্থা খারাপ। জমিদারের তিন কিস্তি খাজনা বাকী। মহাজনও দেনার তাগিদ দেয়। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় অর্জ্জুন। ঠিক এমনি সময়ে গাজন উপলক্ষে গাঁয়ে মেলা বসল।

মেলাতে যে বাঈজী দলবল নিয়ে এসেছিল তার নাম রতনবাঈ। বাঈজীর যেমন রূপ, তেমনি গুণ—নাচে গানে, ছলাকলায় সে অদ্বিতীয়া।

জমিদারের খাজনা মেটাবার আর কোন পথ না দেখে অর্জ্জুন একদিন তার সাধের তবলাজোড়াটা বাঈজীর কাছে বিক্রি করতে গেল। তবলাটা যে ভাল তা বোঝাবার জন্য বাজাল সে। বাজনা শুনে অবাক হয়ে গেল রতনবাঈ, অর্জ্জুনকে

তার ভালো লাগল। যেমন পৌরুষ-মণ্ডিত রূপ অর্জ্জুনের, তেমনি আশ্চর্য্য তার বাজনার হাত।

সে বলল, "তব্‌লার দাম দিচ্ছি, কিন্তু আজ থেকে তোমাকে আমার নাচের সঙ্গে বাজাতেই হবে"—

অর্জ্জুনের শিল্পীমন উল্লসিত হল।

সেদিন রাতেই তার বুড়ো বাপ মারা গেল। তব্‌লার টাকা বাপের শ্রাদ্ধে খরচ হয়ে গেল। শোক। তাছাড়া সংসারে অভাব ও দারিদ্র্য। অর্জ্জুনের মন খারাপ হয়ে যায়।

ওদিকে রতনবাঈ তাকে মদির কটাক্ষ হেনে প্রলুব্ধ করে, নিজের দৃপ্ত যৌবনের জাল বিছিয়ে বন্দী করতে চায়, বলে, "আমার সঙ্গে শহরে চলো—অনেক টাকা রোজগার করবে, এখানে দুঃখ পাও কেন?" গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে অর্জ্জুন ছটফট করে। পরদিন সকালেই বাঈজীর দলের সঙ্গে সে শহরে চলে যায়। টাকার জন্যই এত জ্বালা, শহরে গিয়ে সেই টাকাই রোজগার করবে সে।

দিন যায়। দুর্গা সংসারে একা। ঘরে কিছুই নেই। অতটুকু ছেলে লক্ষণ বাধ্য হয়ে মহাজনের বাড়ীতে মজুর খাটে। তবু তাগিদ দেয় মহাজন, দেনার দাবী করে শাসায়।

ওদিকে বাঈজীর আড্ডায় গিয়ে হতাশ হল অর্জ্জুন। নাচগানের সঙ্গে তব্‌লা বাজানো আর হয় না, শুধু ফাইফরমায়েসই খাটতে হয় তাকে। শহরে বাঈজীর ব্যাবসা আলাদা। প্রতিরাতে জুয়ার আড্ডা বসে তার বাড়ীতে।

ছটফট করে অর্জ্জুন। হঠাৎ একদিন পুলিস এসে হানা দিল আড্ডায়। সবাই পালাল, কিন্তু অর্জ্জুন ধরা পড়ল। বিচারে তার একবছরের জেল হল।

দুর্গা অন্ধকার দেখে। শহরে গিয়েও অর্জ্জুন টাকা পাঠায়নি। এদিকে মহাজনের দেনা কিছুতেই শেষ হয় না, তার তাগিদও থামে না। শেষ পর্য্যন্ত একদিন আদালতের পিয়াদা আর ঢাক ঢোল নিয়ে এসে অর্জ্জুন মণ্ডলের স্থাবর অস্থাবর সব কিছুই ক্রোক করল মহাজন। দুর্গা আর লক্ষণ পথে বেরোল।

তারপর? কোথায় গেল দুর্গা আর লক্ষণ? কি হল অর্জ্জুন মণ্ডলের? সে কি ছাড়া পেল? স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে কি আবার দেখা হল তার?

সে সব কথা এখানে বলা যায় না।

গান

চাষীদের সমবেত সঙ্গীত

ফসল কাটার দিন এসেছে ভাইরে
ফসল কাটার দিন
সোনার ফসল তুলবো গোলায়
শুধবো যত ঋণ।
হাটবাজারে ন্যায্য দামে বেচবো এবার ধান
পল্লী মায়ের আশীষ এ যে মেহন্নতের দান
মনের সুখে কাটবো ফসল কবুল মোদের জান।
বৌকে দিব নূতন শাড়ী
টুকটুকে লাল পাড়া
দেখতে হবে পরীর মতন
সুখেই মাতোয়ারা
চাষীর ঘরে জ্বলবে হাসির
সন্ধ্যামণির তারা।
মরি হায়রে,
অত সুখ ভাল নয়
অত হাসি ভাল নয়
সেই গুড়েতে পড়বে বালি হায়রে,
বলি পরের গাছে ফললে কাঁঠাল
গোঁফেতে দাও তেল
কাকের কি লাভ বল দাদা পাকে যদি বেল,
চৈদ্দা হাতে জমির মালিক
আছেন মহাজন
রক্তচোষা ভুঁড়ো শেয়াল
সাক্ষাৎ শমন
তোদের সকল স্বপন করবে হরণ করাল বদন
মরি হায়রে।

রচনা : কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ

গৌরী—বলি, কেমন তোমার কাণ্ডখানা ভোলা
মহেশ্বর
তুমি শ্মশানে মশানে ফের হয়ে দিগম্বর।
কুচনি বাড়ী আবাস তোমার ভাং ধুতুরায় মন
আর ছাইমাখা ঐ অঙ্গ ঘিরে নাগের গরজন।

ভোলা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ
আমি ছিলাম রাজার ঝি
আমার হাড়ে মাসে করলে কালি
কাণ্ডখানা কি!

হর—ওগো আমার লীলার অন্ত না পায় বিশ্বে
কোনজন
আমি মহাযোগী তাইতো আমার নাইকো
আবরণ
আমি সকল ত্যাগী বৈরাগী তাই শ্মশান
আমার ঘর
তাই কুচনি বাড়ী আমার বাড়ী নাইকো
আপন পর।

গৌরী শোন দিয়া মন
আমি স্বয়ং ত্রিলোচন
আমার লীলার অন্ত না পায় ব্রহ্মা নারায়ণ।

গৌরী—ভোলা, লীলার মুখে ছাই যে তোমার
লীলার মুখে ছাই
তোমার ছেঁড়া ঝুলি ঝেড়েও দেখি খুদের
কণা নাই
তোমার প্রেত পিশাচের সংসারেতে
নিত্য অনটন
তুমি সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধিহারা সদাই অচেতন
ভোলা পষ্ট কথা কই
আর কতই জ্বালা সই
কাল না যাই যদি বাপের বাড়ী
বাপের বেটী নই।

হর—বলি মান ক'রোনা মানিনীগো ধরি তোমার
পায়
ওগো তুমি বিনে পাগল ভোলার ঘটবে
বিষম দায়,
আমি ফরাসডাঙ্গার মিহি ধুতি পরব এবার
থেকে
আর জামাই সেজে রইব সদা আতর গোলাপ
মেখে
আর মাথার জটা কেটে
নেব ফিরিঙ্গি ছাঁট ছেঁটে
আর আপিসেতে চাকরী নেব
তিন সন্ধ্যা হেঁটে।

সকলে—ভোলা যেওনা যেওনা কুচনি মেয়ের বাড়ী
আর পার্বতীরে দিও কিনে খাসা
ঢাকাই শাড়ী॥

রচনা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রতন বাঈজী ও সঙ্গীর দ্বৈত সঙ্গীত

বাঈজী—আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ
এলাম এ কোন ঝুটো শহরে
সঙ্গী—আরে ঝুটোরি তো দাম
তামাম দুনিয়া ভরে।
বাঈজী—যদি সব ঝুটমুট বিলকুল হায়
বেবাক বাজে মিল
সঙ্গী—তবু সাচ্চা তো আছে আজো
চোট না খাওয়া দিল।
বাঈজী—তবে দিল দরদী ঢাল না দরদ
দিল দরাজ করে॥
সঙ্গী—দেব রিনটিনটিন কাঁচের চুড়ী
কানপাশা আর মল
বাঈজী—আরে জানি জানি জানি হায় সব
ঠিকেদারী ছল
সঙ্গী—এ কি ঝকমারি তা বল।
বাঈজী—আরে সর সর সর এত সোহাগ
নাই বা দেখালি
সঙ্গী—দেব হাঁসুলী আর চাঁদের ফালি।
বাঈজী—আর বাড়বে বুঝি বাঁদীর গরব
থালি কোমরে॥

রচনা : গোবিন্দ চক্রবর্তী

লক্ষ্মণের (ছোট) গান

সুখ পাখী যে বড়ই চতুর
দেয়না ধরা ভাই
এবার জনম যাবে বুঝি
এমনি করে তাই।
দারুণ দুখের আগুন ঝরে
শূণ্য পরাণ হা হা করে
একটু স্নেহের পরশ দিতে
কেউ কি দয়াল নাই!
একটু স্নেহের এমনি যাদু
চোর যে-বা সেও হয় যে সাধু
এক নিমেষে জয় করে সে
সারা দুনিয়াই।

রচনা : গোবিন্দ চক্রবর্তী

রতন বাঈজীর গান

চাঁদিনী রাতে প্রিয় যেওনা চলে
প্রেমের মালাখানি দু'পায়ে দলে।
এ ভরা যৌবন
পিয়াসী তনু মন
মদির দু'নয়ন ভাসায়ে জলে।
শুন হে পিতম এ মধু রাতে
নয়নে চাহ মোর নয়ন পাতে
প্রাণের যত মধু
তোমারি লাগি বঁধু
রেখেছি মরমের গোপন তলে।

রচনা : কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ

টিয়ার গান

বিহানে দেখা যদি বন্ধুর সনে
না হয় পোহাব নিশি চাঁদ বিহনে
আঁখিতে আঁখি সে নাই বিঁধিল
পরাণে পরাণ তো বেঁধেই দিল
ডাকিল কোকিল কুহু কুহু কুহু কুহু
কোথায় বনে আহা কোথায় বনে।

তবু দুরু দুরু হিয়া কেমন করে
সদা উড়ু উড়ু ও যে রয়না ঘরে
বাঁধেতো বাসেতে আর ফিরিনে
সোহাগ না হয় শুধু রাখুন কিনে
তুষের অনলে মুহু মুহু মুহু
গোপনে পুড়ি কত ছলি গোপনে।

রচনা : গোবিন্দ চক্রবর্ত্ত

টিয়া ও লক্ষ্মণের (বড়) দ্বৈত সঙ্গীত

টিয়া—এইতো সবে সুরু বিসম্বাদ
শুধু ঘুঘুই দেখেছ চাঁদ দেখনিকো ফাঁদ।
এবার বুঝবে কেমন মজা
পরের টিয়া ঘরে নিয়া আটকে রাখার মজা।
লক্ষ্মণ—[কি, আমি তোকে আটকে
রেখেছি ? বটে !]
টিয়া—আহা অমন বুঝি চটে
বাঁজা ডাঙ্গায় বাঁধবে লড়াই
ফাট্‌বে মাথা কাঁধ
তবে তো বুঝব বড়াই গণ্ডা কড়াই
সুষ্যি কে বা চাঁদ !
লক্ষ্মণ—তবে এখন থেকেই ভেউ ভেউ
তোর বাপের জন্যে কাঁদ॥
টিয়া—[ওঃ বয়েই গেছে ভারি মুরোদ !]
শুধু ঐ মুখখানি তো সার
থাকতো যদি হাতে তবু
ভোঁতা তলোয়ার
লক্ষ্মণ—আমার চাইনে তলোয়ার
তোদের সাতশ' জনে এক ঘুঁষিতেই
করব সাবাড়
গুঁড়িয়ে দেব হাড়।

টিয়া—বাবা ! কোথায় বুঝি ভাঙ্গল পাহাড় !
লক্ষ্মণ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বেলাতেই ওঠা তাঁবু
ঝোলাঝুলি বাঁধ
টিয়া—[বেশ বাঁধতে পারি]
হাতে নাতেই প্রমাণ যদি পাই
এক লহমায় আমায় নিয়ে
পেরিয়ে যাওয়া চাই
সাত সমুদ্দুর, তেরো নদী আর
লক্ষ্মণ—একেবারে সিধে তোর বাপের বাড়ীর দ্বার।
টিয়া—ও ভয় পেয়ে কি এখন এত
পৌঁছে দেওয়ার চাড়॥
লক্ষ্মণ—[কি ভয় পেয়েছি, তবে থাক]
তোর বাপই এসে করবে খালাস
মিটবে মনের সাধ॥

রচনা : গোবিন্দ চক্রবর্তী

চাষীদের সমবেত সঙ্গীত

নতুন চাষের বন্দনাতে জাগো বসুন্ধরা
তোমার বুকে আবাদ করি আশায় জীবন ভরা
পতিত জমিন চাষের গানে
টাটকা সবুজ সোনার ধানে
চাষীর স্বপন সফল করো পরাণ আকুল করা।
তোমার বুকে জনক রাজার লোহার লাঙল বেয়ে
এলেন সীতা ভাগ্যদেবী চাষীর ঘরের মেয়ে
নতুন ধানের মঞ্জরীতে
অন্নহীনে অন্ন দিতে
ঘরে ঘরে দাওনা ফসল সুধায় জীবন ভরা॥

রচনা : কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ

রঙ্গশ্রী কথাচিত্র লিমিটেডের পক্ষ হইতে প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়েল আর্ট কটেজ,
কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা